গান্ধী, রায় ও রাজনীতিতে কল্পস্বর্গের ঐতিহ্য
–শিবনারায়ণ রায়

যে বিষয় নিয়ে আজকে আমি এখানে আপনাদের সামনে একটা আলোচনার প্রস্তাবনা করবো এ বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আমি চিন্তা করেছি। বছর চারেক আগে গান্ধীজিকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা প্রথমে পরিচালনা এবং পরে সম্পাদনা করে বার করবার ভার আমার উপর পড়ে। হয়তো জানিনা আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বইটির কোন কপি আছে কিনা। তার নাম Gandhi, India and the world–এ বইটি ভারতবর্ষ থেকে ছাপা হয়েছে, আমেরিকা থেকে ছাপা হয়েছে এবং অষ্ট্রেলিয়া থেকে – তিন জায়গা থেকে আলাদা করে ছাপা হয়েছে এবং অষ্ট্রেলিয়া থেকে –তিন জায়গা থেকে আলাদা করে ছাপা হয়েছে, এবং তাতে আমি প্রথম চেষ্টা করি যে একজন যিনি নিজে গান্ধীপন্থী নন তিনি গান্ধীর চিন্তায়, গান্ধীর ব্যক্তিত্বে গান্ধীর কর্মপন্থার মধ্যে মূল্যবান কি খুঁজে পেয়েছেন –নিজে গান্ধীপন্থী না হয়েও এই কথাটা আলোচনা করবার। আমরা জীবনে আমার চিন্তায় সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলেছেন মানবেন্দ্র নাথ রায় এবং অপাত দৃষ্টিতে গান্ধী এবং মানবেন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে বিরোধ যত স্পষ্ট নয়। আমি আগে চেষ্টা কোরবো দেখাতে যে কোথায় তাদের মধে সাযুজ্য আছে, মিল আছে এবং কোথায় মিল নেই। এবং যেটা আমাদের পক্ষে বোঝা দরকার তা হোল এই যে মিল নেই বলেই যে সহযোগিতা যে অসম্ভব তা নয়; আবার সহযোগিতা সম্ভব বলেই পার্থক্য ভোলা অসংগত। অর্থাৎ সহযোগিতা হতে পারে। এই অর্থে একজন যিনি গান্ধীর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এবং একজন যিনি মানবেন্দ্র নাথের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী আমি তাদের মধ্যে সহযোগিতার পথে কোন বাধা দেখতে পাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সহযোগিতার ভিত্তি হয কোথায় মিল এবং কোথায় মিল নেই – এই দুয়েরই স্বীকৃতির উপরে। এবং আজকের আলোচনায় আমি এই দুটি দিকই তোলবার চেষ্টা কোরবো।

গান্ধী এবং রায় দুজনেই তাঁদের জীবনের প্রধান অংশ ব্যয় ক'রেছেন রাজনীতির চর্চ্চায় – দুজনেই রাজনৈতিক কর্মী–রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটো পরস্পর বিরোধী ঐতিহ্য আছে। একটা ঐতিহ্য যার সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত দৈনন্দিন জীবনের এবং যারা রাজনীতির ছাক্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি পড়েন–তারা পাঠ্যপুস্তকে সেই রাজনীতির ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি পড়েন–তারা পাঠ্যপুস্তকে সেই রাজনীতির পরিচয় পান যে রাজনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ক্ষমতা যাকে বলা হয় Politics হচ্ছে Pursuit of Power এবং সেই ক্ষমতা পাবার এবং তা প্রয়োগের যে পন্থা সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে এবং সেই জ্ঞান অর্জনের দ্বারা ক্ষমতায় আসীন থাকতে হলে যে শাস্ত্র দরকার হয় জানার তাকেই রাজনীতি শাস্ত্র বলা হয়। এটা হচ্ছে–গিয়ে প্রচলিত রাজনীতি সম্পর্কে যে প্রধান ঐতিহ্য যা হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশে যেমন ধরুন বহুকাল আগেই অর্থশাস্ত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে ক্ষমতায় থাকতে গেলে কেমন করে শক্রদের ঝগড়া বাধাতে হয়। তাতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে ক্ষমতায় থাকতে গেলে কেমন করে শক্রদের ঝগড়া বাধাতে হয়। অর্থশাস্ত্র পড়া থাকলে আজকে বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা কিছুই বিস্ময়কর লাগে না কেননা সবই মোটামুটি অর্থশাস্ত্রে লেখা আছে যে কিরকম করে মিত্রকে নিজের দলে রাখতে হয কিরকম ক'রে শক্রদের মধ্যে ভাগ করে রাঁখতে হয়, শক্রদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে হয় – এ সব করলে পরে ক্ষমায় আসা যায়, ক্ষমতায় থাকা যা'য় পশ্চিমদেশে মেকিয়াভেলি হবস্ থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত বহুলোক যারা রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন তাঁরাও দেখিয়েছেন যে রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি সফল হতে হয় তাহলে প্রথমেই শিখতে হবে যে প্রথমে কি করে ক্ষমতা অর্জন করা যায় এবং সেই ক্ষমতা বজায় রাখা যায় – এই হচ্ছে গিয়ে রাজনীতির মূল চর্চ্চা। কিন্তু রাজনীতির আর একটা ঐতিহ্য আছে। সেট্যা এরই সমান প্রাচীন। যে বক্তৃতাটা আজকে আমি এখানে দেব বলে ঠিক করেছিলাম এটা যখন প্রথম লিখি – ইংরেজীতে লিখি আমার বন্ধুরা এখানে বলেন যে বাংলায় এখানে বলা ভালো এবং সেটা আমার মনে হয় ঠিকই কেন না বাংলাদেশে এখানে যখন প্রায় সবাই বাঙালী সেখানে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়া বা পড়বার কোন মানে হয় না। কিন্তু সেখানে আমি একটা চেষ্টা করে ছিলাম যে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে .Gandhi, Ray and the Utopian Tradition in politices এখন .Utopian Tradition-এর বাংলা করা খুব শক্ত। আমি এখনো ভেবে পাইনি যেঠিক কি শব্দ বললে এই অর্থটা ঠিক প্রকাশ করা যাবে। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে যে এক ধরণের রাজনীতি আছে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতায় আসা এবং ক্ষমতায় থাকা।

আর একধরণের রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে একটা জটিল বিন্যস্ত সমাজে বিভিন্ন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে নৈর্ব্য'ক্তক নানা সম্পর্কের মধ্যে কি করে একটা সৌষম্য আসতে পারে – এরই বিচার এরই আলোচনা এরই শাস্ত্র হচ্ছে রাজনীতি। ক্ষমতা এর উদ্দেশ্য নয়। কোন জায়গায় যদি ৫,১০ বা ১৫ হাজার লোক বাস করে তাহলে স্বভাবত:ই তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকতে পারে না, তাদের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক থাকতে পারে না, তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানানোর সম্পর্কও থাকতে পারে না। দশহাজার লোকের মধ্যে। কিন্তু তারা একসঙ্গে মিলে একটা গ্রাম গড়ে তোলে। ৫০ হাজার এক লক্ষ লোক মিলে শহর গড়ে তোলে। তখন যদি তারা একসঙ্গে বাস করতে চায় তাহলে তার রীতিনীতি লাগে, আইন লাগে অর্থের বন্টনের ব্যবস্থা লাগে জনস্বাস্থ্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। এই সকল কাজ এই কাজগুলো কিভাবে করলে পরে সেই যে অধিকাংশ লোক যার সেখানে একসঙ্গে বাস করছে তাদের প্রত্যেকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হয় – তাদের পরস্পরের প্রতি সম্পর্ক এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ে এই বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা করেন – যে বৈজ্ঞানিকেরা যে দার্শনিকেরা যে মনীষীরা – দ্বিতীয় ঐতিহ্য অর্থাৎ Utopian ঐ তহ্যে তাঁরাই হচ্ছেন গিয়ে রাজনীতিরমূল চিন্তাবিদ। এখন এই যে রাজনীতির ধারণা অর্থাৎ প্রথমে যে রাজনীতির ধারণার কথা বললাম যার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে কি করে ক্ষমতায় আসা যায়, কি করে ক্ষমতায় থাকা যায় কি করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিনাশ করা যায় এই রাজনীতির পরিকল্পনা থেকে আলাদা। ভারতবর্ষে বলা খুব শক্ত যে ধরনের লিখিত যে সাহিত্য আছে একদিকে যেমন অর্থশাস্ত্রের মত বই আমরা পাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তা বোঝবার জন্য, এই Utopian চিন্তা বোঝবার জন্য ভারতবর্ষে আমার জানা নেই ঠিক কোন বই বর্ত্তমান যুগের আগে কেউ লিখেছেন কিনা। বর্ত্তমান যুগে আমরা জানি ভারতবর্ষে দুজন প্রধান ভাবুক এই দ্বিতীয় ঐতিহ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন।

গান্ধী এবং রায় এদের মধ্যে বিরোধ যাই থাক এঁরা দু'জনেই মুখ্যত হ'চ্ছেন গিয়ে রাজনীতিকে সেইভাবে ভেবেছেন যার উদ্দেশ্য নয় ক্ষমতায় আসা বা ক্ষমতায় থাকা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে একটা সুষ্ঠ আদর্শ সমন্বয়নির্ভর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। এইটা হ'চ্ছে গিয়ে তাঁদের রাজনীতির পরিকল্পনা। এখন এই ধরণের পরিকল্পনা অন্তত: পশ্চিমে আমরা জানি বহু আগে থেকে শুরু হ'য়েছে। পশ্চিমের যিনি প্রথম বড় ভাবুক তাঁর সম্বন্ধে আমরা জনি বিস্তারিতভাবে –সক্রেটিশ –তাঁর বিভিন্ন চিন্তা প্লেটো তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে রেখে গেছেন। তাতে সক্রেটিস রাজনীতিতে এই দু'টো ধারণা নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। একদিকে তিনি দেখিয়েছেন যে Politicsþ হতে পারে Science of Poer and এবং of the poissible আর একদিকে তিনি দেখিয়েছেন যে Politics হ'তে পারে A Study of Civic Virtues দু'টো আলাদা পরিকল্পনা। এবং যেহেতু তিনি একজন খুব বড় মণীষি ভাবুক ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি দু'টো বিকল্পকেই আমাদের সামনে রেখে গেছেন – তিনি বলছেন না যে এইটিকে গ্রহণ ক'রো বা ঐটিকে বাদ দাও তিনি বলেছেন যে এই দু'টো বিকল্পেরই আলোচনা দরকার . Plato-র লেখার মধ্যে আমরা দ্বিতীয় বিকল্পের কথা জানি। তিনি পরিকল্পনা ক'রেছিলেন একটা আদর্শ রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রে দার্শনিকেরাই রাজা যে দার্শনিকেরা রাজা হ'বার আগে তাদের নিজেদের ব্যক্তিকত সমস্ত সম্পত্তি সমাজকে দিয়ে দিয়েছেন। Plato র ধারণায় কোন লোক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাবার অধিকারী নায় – যদি তার কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে। এদিক থেকে Plato সমকালীন যুগের যে কম্যুনিষ্ট আদর্শ বলা হয় – কোন দেশেই যে আদর্শের প্রয়োগ ঘটেনি এখনও পর্য্যন্ত নামে যাই বলুক চীন আর রাশিয়া কিন্তু সেই আদর্শ Plato র মধ্যে আমি প্রতিভাত হ'তে দেখেছি। এই যে মূলকথা যে তুমি যদি প্রধানমন্ত্রী হতে চাও তাহলে তোমার নিজের নামে কোন Bank Account থাকা চলবে না। অর্থাৎ রাজনীতিতে যিনি ক্ষমতা পাবেন তিনি বস্তুত: সন্ন্যাসী হ'বেন। এই পরিকল্পনা Plato Republic এর মধ্যে স্পষ্ট ক'রে উপস্থিত ক'রেছেন। এই আদর্শকে আমি বলি .Utopian আদর্শ। পরের যুগে আঠারো শতাব্দীতে এই ধরণের আবার রাজনীতির আদশের কথা রুশোর লেখায় আমরা পড়ি। ভারতবর্ষে যে দু'জনের কথা আমি এখানে আলোচনা করছি – গান্ধী এবং মানবেন্দ্র রায় তাঁরা নয় কেননা দু'জনের জীবনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মিল চোখে পড়ে।

দু'জনেই অল্পবয়সে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিদেশে যান। গান্ধী যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ভারতবর্ষ থেকে বাইরে যান তখন তাঁর বয়স হবে ২৩ কি ২৪ ১৮৯৩ সালে। এবং তারপরে তিনি ২০ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটান। তাঁর যৌবন এবং প্রথম প্রৌঢ় বয়স – তাঁর চিন্তার গঠন রাজনীতির পরীক্ষানিরীক্ষা, তাঁর প্রথম এবং সম্ভবত সবচাইতে মূলখবান রচনা –এ সমস্তই ভারতবর্ষের বাইরে। গান্ধীর জীবনে সেটা আমি এখানে পরে আলোচনা কো'রবো আমার মতে সেটা তাঁর জীবনের

সর্বশ্রেষ্ঠ – Marx এর জীবনে যেমন Communist Manifesto, M. N - Roy এর জীবনে তাঁর বিখ্যাত বই – ছোট বই Neo-Humanism তেমনি গান্ধীর জীবনে গান্ধীর আদর্শের কেন্দ্রীয বই হ'চ্ছে Hind Swaraj. এই বই যখন গান্ধী লেখেন ঠিক তার পূর্ব্বে কিছুকাল আগে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে কারাবাস করেছেন প্রথম সত্যাগ্রহের পর। যতদুর মনে হচ্ছে তখন তাঁর বয়স চল্লিশের মত হ'বে। বোধহয় ১৯০৯/১০ সালে। যে সব চিন্তা এই লেখার মধ্যে প্রধান প্রথম হয়ে উঠেছে সেইসব চিন্তার উৎস কিন্তু ভারতীয় তিন্তায় খুব বেশি পাওয়া যায় না। গান্ধীর আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখবেন গান্ধী সেখানে তিনজন বিদেশী ভাবুকের কথা উল্লেখ ক'রেছেন – আফ্রিকায় থাকার সময় যাঁদের লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং যাঁদের লেখা তাঁর জীবনে রূপান্তর আনে। এঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন গিয়ে Ruskin । Ruskin যিনি বলেছিলেন যন্ত্রবিপ্লবের ফলে ইউরোপের মানুষের মন দীন থেকে দীনতর হ'য়ে গেছে – মানুষ যতই অর্থ বাড়াচ্ছে যন্ত্র ক'রে ততই তাঁর যে ব্যক্তিত্বতা খর্বতর হয়ে আসছে। Ruskin যিনি বলেছিলেন যে সবরকমেরই শ্রমই সমান মূল্যবান। একজন যিনি প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাপক বা উপাচার্য্য আর একজন লোক যিনি রাস্তার ঝাঁট দেন বা মালি – এ দু'জনের মধ্যে পরিশ্রমের মূল্য নমাজ দেয় একজনকে যেমন ১০ হাজার টাকা আর একজনকে ১০ টাকা সেটা অসংগত যুক্তিবিরোধী। রাস্কিনের এই চিন্তা গান্ধীর উপরে গভীর প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয় যিনি প্রভাব ফেলেন তিনি হ'চ্ছেন আমেরিকান ধরো। ধরো ঊনিশ শতাব্দীতে জেলে গিয়েছিলেন Tax এর বিরোধিতা ক'রে। খরোর লেখায় এই জিনিস হোল নিজের বিবেকের প্রতি আনুগত্য –সেখানে আমার বিবেকের সঙ্গে সরকারী আইনের বিরোধ বাধে সেখানে আমার বিবেকের নির্দ্দেশ আমি অনূসরণ কোরবো – সরকারী আইন আমি মানবো না। গান্ধী এই চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে দক্ষিড় আফ্রিকার যে আইন তাঁর কাছে মনে হ'য়েছিল অন্যায় তার বিরোধিতা ক'রে জেলে গিয়েছিলেন। তৃতীয় যে ভাবুক গান্ধীর উপর গভীর প্রভাব ফেলেন এবং সবথেকে বেশি ফেলেন তিনি হচ্ছেন রাশিয়ান – কাউন্ট লিও টলস্টায়। আমি এই কথা বলছি ওই কারণে যে গান্ধীকে লেংটি পরিয়ে বিশুদ্ধ ভারতীয় চাষী এইভাবে লোকের সামনে উপস্থিত করা এরচেয়ে বাজে প্রস্তাব আরকিছু হতে পারে না। গান্ধী স্বেচ্ছায় আদর্শের দ্বারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে চেষ্টা করেছেন ভারতীয় চাষীর সঙ্গে একাত্ম হ'তে। কিন্তু সেই একাত্ম হবার যে চেষ্টা সেই প্রেরণা তার আসেনি ভারতীয় রাজনীতির কোন বই পড়ে। সেই প্রেরণা তার এসেছে সম্পূর্ণ পৃথিবীর অন্যান্য বিভিন্ন ভাবকের রচনা পড়ে এবং এই ভাবুকরা কোন এক দেশের ভাবুক না – যেটার উপর আমি খুব জোর দিতে চাই। একজন ইংরেজ, একজন American একজন Russian এদের লেখা পড়ে গান্ধী গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হ'ন এবং সেই চিন্তাকে তিনি তাঁর নিজের চিন্তায় মধ্যে একাত্ম করে নেন। একটা পরীক্ষা পাশের মত বোঝার মতন আমরা যা করি বই মুখস্ত করে পাশ করে যা আমরা ভুলে যাই – তা না ক'রে গান্ধী খুব কম বই পড়তেন। যা পড়তেন তার উদ্দেশ্য ছিল তিনি তা থেকে নিজের জীবনে কি গ্রহণ করতে পারেন। তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রহণ করে তাঁর নিজের যে আদর্শ সেই আদর্শ Hind Swaraj এ উপস্থিত ক'রেন।

এর পাশে যখন আমরা রায়ের কথা গ্রহণ ক'রি, যখন তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন তখন তাঁর বয়সও ঐ ২৭–২৮ হবে। তিনি প্রায় ১৫ বছর বাইরে ছিলেন। প্রথমে আমেরিকাতে। তারপরে মেক্সিকোতে তারপরে সোভিয়েট ইউনিয়নে, কিছু পরিমাণে ইউরোপে কিছু চীনে – এইসব বিভিন্ন দেশে সেখানকার যে বৈপ্লবিক আন্দোলন, সেখানকার যে সামাজিক রূপান্তর ঘটছে তার সঙ্গে তার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাঁর নিজের মনকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন। এখানে গান্ধীর সঙেগে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটা আশ্চর্য্য মিল – আশ্চর্য্য আমি এই কারণে বলছি যে, আমি তো আর অন্য কোন ভারতীয় জানি না যাঁদের জীবনে এই জিনিষ ঘটেছে। নেহরু বিলেতে লেখাপড়া শিখে এখানে এসেছেন – কিন্তু নেহরু যখন বিলেতে লেখাপড়া শিখেছেন তখন তিনি সেখানকার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সেখানে তিনি কোন একটা বড় আন্দোলনের সঙ্গে অংশ নেন নি। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা বড় আন্দোলন নিয়ে গ'ড়ে তুলেছেন। মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকোতে নিজের চেষ্টায় প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছেন। এই দিকে থেকে এদের মধ্যে একটা মিল দেখছি যে এদের যে মন তা গড়তে হ'য়েছে দেশের মাটী থেকে বাইরে কেটা বড় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে। এঁরা গ্রহণ ক'রেছেন বহু জায়গায় থেকে। মানবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই প্রধান উৎস ছিল Marx পরে ১৮ শতকের যাঁরা যুক্তিবাদী ফরাসী দার্শনিক তাঁদের লেখা, ১৯ শতকের যাঁরা নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক তাঁদের লেখা – এর গভীর প্রভাব পড়েছে তাঁর চিন্তাতে। এবং এই চিন্তা নিয়ে তাঁরা বিদেশে গিয়ে বিদেশী হ'য়ে থাকেনি। তাঁরা ফিরে এসেছেন নিজের দেশের মাটীতে, দেশের মানুষদের মধ্যে এবং চেষ্টা

ক'রেছেন তাঁদের যে বিশ্বাস তাঁদের তাঁদের যে জ্ঞান তাঁদের যে দর্শন এই অভিজ্ঞতা তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং পঠন–পাঠনের মধ্যে অন্য দেশে গড়ে উঠেছিল তাকে এই দেশের সমস্যার সমাধানে, এই দেশের মানুষের জীবনকে সুন্দরতর ক'রার জন্য একটা উদ্যোগে প্রয়োগ ক'রতে।

শুধু মিল এখানেই শেষ হ'য় না। আর একটা বড় মিলের উল্লেখ ক'রে তারপরে তফাৎ বা সেই প্রসঙ্গ তুলব। আধুনিককালে আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যেকানে অধিকাংশ লেখকের মনের প্রায় এই রকম ধারণা হ'য়ে গ্যাছে আমার বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাসের মত হ'য়ে গাছে যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ – সমস্ত ক্রিয়াকার্যাকে যন্ত্রনির্ভর – একরা শুধুমাত্র উচিৎ নয় একটা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মনে একটা বিশ্বাস হ'য়ে গেছে যে ভারতবর্ষে কোন সমস্যা সমাধান ক'রা যাবে না যদি দিল্লীতে সব ক্ষমতা এসে জমা না হয়। ভালোমন্দ প্রশ্ন নয় এটা হ'বেই –এটা হ'তে বাধ্য চীনে হ'য়েছে, রুশে হয়েছে–ঘরের পাশে অন্যান্য দেশে হয়েছে– ইন্দোনেশিয়ায় হয়েছে – ফিলিপিনে হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের দেশে একটা খুব ব্যাপকভাবে এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে – যে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা শুধু কাম্য নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী। এই বিশ্বাসকে আমাদের জানার মধ্যে ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র যে দুইজন লোক সম্পূর্ণভাবে বর্জন ক'রেছেন প্রত্যাখান করেছেন তাঁরা একজন হ'লেন গান্ধী অন্যজন মানবেন্দ্রনাথ। গান্ধী তাঁর হিন্দ স্বরাজে খুব স্পষ্ট ক'রেই যে সমাজ যে রাজনীতি যে ভারতীয় পুর্নগঠনের স্বপ্ন করেছেন তা হচ্ছে গিয়ে বিকেন্দ্রীকরণ – শাসনমুক্ত সমাজ। মেন সমাজ যেখানে সরকারের উপস্থিতি সব চাইতে কম – একেবারে না থাকলে আরও ভালো। যেখানে স্থানীয় লোকেরা পঞ্চায়েতে পাঁচজনে, মিলেমিশে তাঁদের সমস্যার সমাধান নিজেরা ক'রে তারা কোলকাতা দিল্লীপ উপরে নির্ভ ক'রে না। গান্ধী বলবার চেষ্টা ক'রেছেন যে ইংরেজ শাসনে এসে আমাদের যে বিকৃতি ঘটেছে – সেই বিকৃতি হচ্ছে এই যোগে যেখানে গ্রামের জীবন গ্রামের লোকেরা নিজেরা নির্দিষ্ট কোরতে এখন গ্রামের লোক নির্ভর করছে মফ:স্বলের জেলা শহরের ওপরে, জেলা শহর নির্ভর করছে প্রাদেশিক শহরের ওপরে, প্রাদেশিক শহর নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় শহরের ওপরে, কেন্দ্রীয় শহর নির্ভর করছে গভর্ণর–জেনারেলের ওপরে, সম্প্রতিকালে সম্ভবত: প্রদানমন্ত্রীর ওপরে। এই যে ধারাটা গান্ধীর মত ছিল পশ্চিম আমাদের মধ্যে এই বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে – এর থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা দরকার। তাহলে এর বিকল্প তিনি কী চাইতেন? তিনি চাইছিলেন যে সারা দেশময় পঁচাত্তর হাজার এই গ্রামে সাধারণ মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেবে। সচেতনভাবে দায়িত্ব নেবে, পরস্পর সহযোগ করবে এবং এই কারণে তারা জেলার যে মহকুমার শহর বা প্রাদেশিক যে রাজধানী তার ওপর নির্ভর করবে না। দিল্লীকে তারা দূর অন্তই রাখবে। এখন এটা ঠিক কি বেটিক এই নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি এর্ চিন্তাটা ভারতবর্ষের সমকালীন চিন্তা এবং ভারতবর্ষের বাইরে ইউরোপ আমেরিকা আমি যেখানে যেখানে ঘুরেছি সেখানকার সমকালীন চিন্তার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানবেন্দ্রনাথ প্রথম দিকে –যখন তিনি বিশুদ্ধভাবে কম্যুনিষ্ট চিন্তার প্রভাবে ছিলেন তখন তিনিও–যে চিন্তার কথা আমি আগেই বলেছি – কেন্দ্রীভূত শক্তির অবশ্যম্ভাবিত– সেই চিন্তার বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষের যে কুড়ি বছর এ চিন্তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ সরে আসেন এবং ১৯৪৫–এর পর থেকে তাঁর যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে তাতে তিনি যে রাজনীতি এবং যে সমাজে পরিকল্প প্রস্তুত করেছেন তার মূল ভিত্তি হচ্ছে গিয়ে এই ধরণের দেশব্যাপী, সক্রিয়, সংঘবদ্ধ, স্তানা গণতন্ত্র যেখানে কেন্দ্রের কাজ সব চাইতে কম। রায় এবং গান্ধী দুজনেই একটা খুব বড় কথা বলেছেন যা আমার কাছে খুব মূল্যবান লেগেছে। তিনি বলেছেন যে সমাজে যথার্থ ক্ষমতা এইভাবে বহু জায়গায় ছড়ানো থাকে যেখানে যথার্থই গ্রামগুলো সক্রিয়, সেই দেশের পক্ষে যুদ্ধ করা অসম্ভব। যুদ্ধ করা তখনই সম্ভব যখন কেন্দ্রে তারা নিজেদের একটা খুব বড় সৈন্যবাহিনী, ট্যাংক, কামান, বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যেখানে ইচ্ছামত যুদ্ধ বাধাবার অধিকার কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের নেই, সেখানে কোন কিছু করতে গেলে এই সর্বব্যাপী, সক্রিয় যে স্থানীয় গণতন্ত্র তাদের সমর্থন ছাড়া করা যায় না সেখানে এই ধরণের সিদ্ধান্ত কখনো কেউ নিতেই পারে না। এখানে দুজনের মধ্যে একটা গভীর মিল আছে। দ্বিতীয় যে গভীর মিল আছে সেটা হোল যে এরা দুজনেই ওই যে অন্য বিকল্প রাজনীতির কছা বলেছিল তার একটা নূনতম ব্যবহারিক প্রস্তাবকে আগাগোড়া বাতিল করে দিয়েছেন। সে প্রস্তাব হচ্ছে এই যে যদি আমার উদ্দেশ্য ভাল থাকে তাহলে যে কোনো উপায় প্রয়োগ করা যায়। গান্ধী বললেন, না, উদ্দেশ্য ভাল হলেই যে কোনো উপায় প্রয়োগ চলে না। এ দুয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, উপায় এবং উদ্দেশ্যের মদ্যে রায়ের শেষের

দিকের সমস্ত লেখায় এই জিনিষটার ওপর বার বার তিনি খুল জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে একটা জিনিসি গড়ে তুলতে হবে। এরকম নয় যে দূরে, অনেকটা দূরে একটা উদ্দেশ্য আছে, আর আমরা এইখান থেকে সেইখানে চলে যাচ্ছি। তা নয়। আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই উদ্দেশ্য আমাদের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠছে। আমাদের যদি একটা স্বাধীন সমাজ গড়তে চাই তাহলে আজকের প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের সেই স্বাধীনতাকে একটু একটু করে আরও বেশি বাস্তব করে তুলতে হবে। একদিন হঠাৎ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা স্বাদীন হয়ে যাব না। এবং আমরা স্বাধীন হব এ উদ্দেশ্যের জন্য যদি আজকে আমরা স্বাধীনতাকে খর্ব করি তাহবে আর কোনদিন স্বাধীন হব না, চিরকাল খর্বতাই বেড়ে যাবে। এই দিক থেকে তাঁরা –প্রচলিত যে রাজনৈতিক মতামত, চিন্তা তার থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদা। আরও কিছু কিছু মিল আছে। কিন্তু আমি সমস্ত কাহিনী এক বক্তৃতায় দিতে পারব না শুধু এইখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি মিল কোথায়।

এবার আমার বক্তব্য শেষ করার চেষ্টা করব যে মিল নেই কোথায়। তার কারণ আমার ধারণা মিল আছে এটা যেমন সত্য, মিল নেই এটাও তেমন সত্য, মিল নেই এটাও তেমন সত্য, এই দুটো সম্বন্ধে স্বষ্ট ধারণা না থাকলে যে সহযোগিতা হয় তা সৎ সহযোগিতা নয় তার কোনো বুনিয়াদ পাকা হয় না। তফাৎ এইখানে যে গান্ধী যে বিকেন্দ্রত সমাজে কথা ভাবছিলেন গান্ধী যে উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা ভেবেছিলেন, এবং আমার ধারণা দুটো সিদ্ধান্তই তাঁর ঠিক সিদ্ধান্ত, অন্ত: তার সঙ্গে আমি নিজে সম্পূর্ণ একমত। এই সিদ্ধান্তকে তিনি পুরোপুরি একটা দর্শনের মধ্যে উপস্থিত করেছিলেন যে দর্শনের কেন্দ্রে আছে তাঁর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যে দর্শনের কেন্দ্রে আছে তাঁর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যে দর্শন মূলত: ধার্মিক দর্শন, যে দর্শন তিনি বাইরে থেকে পান, যে দর্শন তাঁর শৈশব কালে তিনি জৈন এবং বৈষ্ণব চিন্তা থেকে আহরণ করে ছিলেন। এই দর্শনের কতকগুলো লক্ষণ আছে। প্রথম হল যে সমস্ত জীবন, সমস্ত প্রকৃতি, সমস্ত মানুষ সমস্ত জগ পরিচালিত হচ্ছে এমন এক অশ্চর্য রহস্যময় শক্তির দ্বারা যে শক্তি আমাদের থেকে অনেক ঊর্দ্ধে, যে শক্তকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই, যে শক্তিকে আমরা ভক্ত করতে পারি, ভালবাসতে পারি, আমরা নত হতে পারি, কিন্তু তাকে আমরা জ্ঞানের গোচর করতে পারি না। এই যে ধারায় দার্শনিক চিন্তা, মানবেন্দ্র নাথ–অন্তত: ১৯২০ সাল থেকে তাঁর যে রচনা প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যু পর্যন্ত তাতে আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন। তিনি প্রকৃতিবাদী, তিনি জড়বাদী, তিনি বস্তুবাদী, তাঁর দার্শনিক চিন্তাতে প্রকৃতি বা মানুষের অতীত অন্য কোন শক্তি বা সত্তার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। তিনি মনে করছেন এই বিশ্বব্রহ্মান্ড একটা জড় জগত যার ভেতরে বির্বত্তনের প্রক্রিয়াতে মানুষ নামে জীব দেখা দিয়েছে, যে মানুষের মস্তিষ্ক অন্য সমস্ত প্রাণীর চেয়ে জটিল এবং উন্নত এবং এই মস্তিষ্ক থাকার ফলে সেই মানুষ নামক প্রাণী নিজের ভাগ্য নিয়ে নির্ণয় করতে সক্ষম বা অন্য প্রাণীরা পারে না। কিন্তু তার মানে নয় যে এই মানুষের মধ্যে কোনো ঐশী শক্তি আছে। এই মানুষের সক্তিও সীমাবদ্ধ শক্তি। আমরা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং প্রয়োগের দ্বারা আকাশে উড়োজাহাজ তুলতে পারি, এ ক্ষমতা আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের এই শক্তি আছে বলে যে আপেক্ষিক আকর্ষণের শক্তি, পৃথিবীর কেন্দ্রীয় আকর্ষণের শক্তি তাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। Gravitation Gravitation–ই থাকবে আমরা আকাশে উড়ি আর না উড়ি। Gravitation তার নিজের মতে চলবে সেটা আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের উপর নির্ভর করবে না। এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ডের ভেতরে রায় কোনো উদ্দেস্য খুঁজে পান নি। মানুষের মধ্যে তিনি পেয়েছেন। মানুষের উদ্দেশ্য মানুষের বিকাশের মধ্যে। কিন্তু মানুষের বিকাশের মধ্যেই মানুষের উদ্দেশ্য থাকা মানে নয় যে চন্দ্র সূর্য্য তারা প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে মানুষের বিকাশের জন্য। এরা মানুষের আবির্ভাবের আগেও ছিল, মানুষ যদি কোনদিন নিজেকে বিলোপ করে দেয় তাহলেও থাকবে। অর্থাৎ এমন কোনো একজন ঈশ্বর, দেবতা ব্রহ্ম বা এমন কোনো পুরুষ নেই যাঁর প্রধান মাথাব্যথা মানুষের কল্পনা। এর অন্য কোনো ভিত্তি নেই। এবং এই জায়গাতে দুজনে চিন্তার পার্থক্য গভীর এবং এর পরে কোনো রকম সেতু গড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় যেখানে এদের মধ্যে গভীর অমিল সে হল যে গান্ধী সধুমাত্র যে ধর্ম কেন্দ্র করে তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছেন তাই নয় তিনি বিজ্ঞানের বিরোধী, তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আস্থাহীন। তাঁরধারণা যে বিজ্ঞান মানুষকে দুর্নীর্তিপরায়ণ করেছে। যাঁরা 'হিন্দ স্বরাজ' পড়েছেন তার ভেতরেই দেখবেন গান্ধী অনকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন চিকিৎসা শাস্ত্র, রেলওয়েই, রসায়ন, এই সব জিনিসি কী করে দুর্নীতি পরায়ণ করেছে। এ হচ্ছে তাঁর একটা প্রত্যয় এবং তার ফলে তার সাধ্যমত তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর যে আদর্শ সমাজ সেই সমাজ থেকে বিজ্ঞানচর্চাকে বাদ দিতে। রায় অপরপক্ষে মনে করেছেন তাঁর যে বিবেচিত সমাজ, তাঁর যে সেই পারস্পরিক সহযোগিতাশীল শাসনমুক্ত মানুষের সমাজ

সেই সমাজ সম্ভব বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা। বস্তুত: বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ছাড়া এ বিকেন্দ্রিত সহযোগিতাশীল স্বাধীন সমাজ যে সম্ভব তা রায় বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং এখানে দুজনের মধ্যে গভীর অমিল দেখা দিচ্ছে। তৃতীয় এবং শে, অমিল যেটা আমার চোখে পড়ছে এবং যেটা পরস্পর যুক্ত সেটা হল এ যে গান্ধী বিশ্বাস করতেন এবং সেখানেও তাঁর উপরে জৈন এবং বৈষ্ণব চিন্তার প্রভাব খুব প্রবল। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে মানুষের প্রয়োজন, মানুষের কামনা, মানুষের আসক্তি—তাকে যতই কমানো যায় ততই মানুষের পক্ষে কল্যান। অর্থাৎ যদি একখানা নেঙটীতে আমার চলে যায় কোনো কারণ নেই কেন আমি দুটো ধুতি চাইব। যদি একটা শ্লোক পড়ে আমি সমস্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব বুঝতে পরে থাকি কী দরকার আমার একটা পাঠাগার করবার। যদি আমার চারটে দেওয়াল আর তার মাথার ওপরে খড়ের ছাউনি দিলে আমার থাকার আশ্রয় হয়ে যায় তবে কী প্রয়োজন একটা বাগান দিয়ে অট্টালিকা বানাবার! এখন আমি আবার এখানে কোনো পক্ষ নিচ্ছি না। আমি বলবার চেষ্টা করছি যে গান্ধী একটা বিশেষ ঐতিহ্য হচ্ছে নিগ্রহপন্থী ঐতিহ্য। আত্মনিগ্রহের। আমরা একে বলব, নিগ্রহপন্থী না বলে বলব ব্রহ্মচারী ঐতিহ্য, ত্যাগীর ঐতিহ্য, সন্ন্যাসীর ঐতিহ্য, যা ঐতিহ্যে মানুষ বাইরের জিনিষের ওপর কম নির্ভর করে। এখন গান্ধী এর স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দিয়েছেন। শুধুমাত্র তাঁর ধর্মের যুক্তি নয়, ব্যবহারিক যুক্তি। যে যতই আমরা নির্ভর করি বস্তুর ওপরে ততই আমরা নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি। এবং এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়। ধরা যাক যে আমি যদি পাঁচ টাকা মাইনের চাকরী করি আমার পক্ষে যত সহজে সে চাকরীটা কাল আত্মসম্মানের জন্য ছেড়ে দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা মাইনের চাকরী করি তাহলে সেটা সম্ভব দয়। তখন আমি নানারকম যুক্তি দিয়ে দেখাই যে করেছে বটে একটু অত্মস্মান তবে ওটা এমন কিছু খুব বড় জিনিস নয়। আমার মোহ্ বাড়ে। আমার যদি প্রয়োজন কম থাকে আমি কালকে লোটা—কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি কিন্তু আমার যদি পাঁচশো রকমের সঙ্গে লটবহর চাই। আমার পাঁচটা সুটকেশ আছে, সাতটা কুকুর আছে, পাঁচটা গাড়ী আছে তাহলে আমার পক্ষে সব সময়েই ভয়, সঙ্কোচ আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি না। গান্ধীর যুক্তির পেছনটা আমি বুঝতে পারি এবং আমি আকৃষ্ট বোধ করি। কিন্তু এর ভেতরে বিপদ হচ্ছে এই যে মানুষের যে বিকাশ ঘটছে, মানুষের যে বহুমুখী বিকাশ ঘটছে। সেই বিকাশ ঘটার জন্য কতগুলো বাহু অবস্থার প্রয়োজন মানুষ যদি ছবি আঁকতে চায় তার রং দরকার, তুলি দরকার, ক্যানভাস দরকার ত যদি সে না পায় তাহলে তার নেই সেই ছবি অত্যন্ত আদিম স্তরেই আটকে থাকবে।

মানুষের যদি চিন্তা কে বহু লোকের কাছে পোঁছে দিতে হয় তাহলে শুধু মুখে মুখে শ্লোক করলে চলবে না, দীর্ঘ জীবন ধরে সাধনা করে একটা লোককে বই লিখতে হবে, সে বইটাকে ছাপাতে হবে, ছাপিয়ে পৌঁছে দিতে হবে, এরজন্য অনেক যন্ত্রপাতি অনেক কিছু দরকার। আমি যদি আমার সেই প্রয়োজনকে খুব সীমাব্ধ করি তাহলে এই যে বহুমুখী বিকাশটা স্তব্ধ হয়ে যাবার একটা আশঙ্কা ঘটে। যেমন গান্ধীজীর উপরে প্রধান প্রভাব দেখতে পাচ্ছি আমরা বৈষ্ণব, জৈন, ভারতীয় চিন্তা মুখ্যত:। রায়ের ক্ষেত্রে এখানে সব চাইতে বেশী প্রভাব দেখছি পশ্চিমী এপিকিউরাস, ভারতীয় যাঁর লেখা প্রায় পাওয়াই যায় না দু একটা টুকরো টাকরা ছাড়া চার্বাক – তাঁর প্রভাব। রায়ের বক্তব্য এইই যে শুধুমাত্র আমার নিজের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য সঞ্চয় এবং সংগ্রহ করা পাপ। অন্যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে যে সমূহ, যে সমষ্টি, যে দেশবাসী সমাজ, তাদের ভোগের সুযোগ তাদের ভোগের সম্পদ, তাদের ভোগ করবার জন্য যে সূক্ষম অনুভূতির বিকাশ এটা যে সমাজ জানে সেই সমাজ ভালো সমাজ। অর্থাৎ যে সমাজে ধ্রুপদী সঙ্গীত শুধুমাত্র পাঁচজন বিত্তবান ঘরের ছেলে মাথা নেড়ে কালোয়াতী শোনে না, সে সমাজে – সাধারণ মানুষ গাছতলায় বসে ধ্রুপদী সংগীত উপভোগ করতে পারে, যেখানে দেশের লোক এত মুঢ় অশিক্ষিত হয় না যে তারা অজন্তর মতন অপূর্ব শিল্প দেখে সেখানে নিজের সই করে দিয়ে আসে না। তারা একটু শিক্ষা পায় যে এটা কত মূল্যবান বোঝবার এবং সেখানে শুধুমাত্র অজন্তাতেই শিল্পের প্রকাশ ঘটে না। দেশে আরো অজস্র অজন্তা দেখা দেয়। রায় সে রকম সমাজ চেয়েছেন। এখানে দুজনের মধ্যে তফাৎ আছে। রায় চেয়েছিলেন সঙ্গীত। গান্ধী আমরা জানি, গান্ধীকে প্রশ্নও করা হয়েছে। গান্ধীর গানের মধ্যে মীরার ভজন পছন্দ ছিল। কোনো খুব জটিল, উচ্চ মার্গ সঙ্গীত বোঝবার তাঁর ক্ষমতাও ছিল না, আগ্রহও ছিল না। তিনি কাব্যসাহিত্য প্রায় কিছুই পড়েন নি। দু'একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা—তার বাইরে তিনি যেতেন না। চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর কোনো রুচিই ছিল না। এখন যদি আমরা মনে করি যে এই যে সমস্ত প্রকাশ' শিল্প, সঙ্গীতে, কাব্যে, নাটকে—এ সব প্রকাশের ভেতর দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে এবং এটা কাম্য এবং কোন সুস্থ সমাজ এ সমস্ত

বিকাশের বন্দোবস্ত না ক'রলে সুস্থ থাকে না। তাহেলে সেক্ষেত্রে গান্ধীর এই যে নিজেকে সংকুচিত ক'রে আমার যে আদর্শ সেটাকে গ্রহণ ক'রতে খুবই অসুবিধা হয়। কিন্তু আমি উভয়ক্ষেত্রে এই কথাটা বলার চেষ্টা ক'রছি যে আমার বলার উদ্দেশ্য ে নয় আপনাদের বা কাউকে বলা যে আপনি এটা বাছুন বা না বাছুন অমার বলার উদ্দেশ্য হো'ল আপনারা বাছবার বা না বাছবার আগে জিনিসটা বুঝবার চেষ্টা করুন। সে এই দুজন ভাবুক, ভারতবর্ষে একমাত্র দুজন ভাবুক যাঁরা রাজনীতিতে নিজেদের মৌলিক চিন্তা এ দেশকে দিয়ে গেছেন। আমার ধারণা পশ্চিমেও আমার জনা নেই দু'একজন ছাড়া যাঁরা এ ধরণের মৌলিক চিন্তা দিয়ে গেছেন। অধিকাংশই হ'চ্ছে গতানুগতিক কথা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এ দেশে না বিশ্ববিদ্যালয়ে না বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আমরা অমাদের এই ধরণের মৌলিক চিন্তা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করি। আমি অন্তত: এ দেশে দেখিনি যে রায় কিংবা গান্ধীজির চিন্তা নিয়ে যারা উচ্চকোটীর ভাবুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র তাঁরা খুব চর্চ্চা–গবেষণা ক'রছেন দেখিনি –অন্যদেশে হ'লে অনেক বেশি তারা এ নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ ক'রত এবং বস্তুত: এদের উপরে বিদেশে যত বই লেখা হ'য়েছে আমাদের দেশে তা হ'য়নি। দ্বিতীয় আমার মনে হয়েছে যে শুধু বই লেখাটা তো বড় কথা নয়–বড় কথা হোল এর প্রয়োগটা এবং আমি যতদূর দেখতে পারছি আমার এই ২৫ বছরে – আমার এই যৌবন কাল থেকে আমার এই প্রৌঢ় অবস্থাতে যে আমরা সেই গতনুতিক দিকেই চলেছি। আমর এইসব মৌলিক চিন্তা নিয়ে পরীক্ষারও চেষ্টা করিনি – যে অল্প একটা সীমাবদ্ধ পরীক্ষা তাও ক'রছি না। আমরা সেই কতানুগতিক চিন্তা – শক্তির কেন্দ্রীকরণ –এই যে সমস্ত বড় বড় পরিকল্পনা এবং Project করা হ'চ্ছে সেই Project এর ক্ষেত্রে এই জিনিষটা নেই যে ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যদেশের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা, আমার এখানেসময় ছিল না বলবার যে একক্ষেত্রে রয় এবং গান্ধী দুজ'নেই যে আর্থিক পরিকল্পনা করেছিলেন তার যেখানে মূল মিল ছিল সেটা ছিল এই যে পরিকল্পনার ভিত্তি হবে, গ্রাম–শহর নয়। রায় বারবার বলেছিলেন যে আমাদের দরকার নয় বিরাট .Power Project করা। আমাদের দরকার প্রত্যেক গ্রামে অনেকগুলো করে নলকূল করা প্রত্যেক গ্রামে পুষ্পরিণী তৈরী করা সেখানে মাছ দেওয়া যাতে সেই গ্রামের ছেলেরা এই কাজে নিযুক্ত হয়ে প্রত্যেক গ্রামের সমপ্ত বাড়াতে পারে। যদি সেই সম্পদ না বাড়ে তাহলে সম্পদ বাড়াতে দেশের কোন কল্যাণ হবে না – কেন না তখন সেই সম্পদ কাজে লাগবে যুদ্ধের কাজে। যে সম্পদ লোকের ভোগে লাগে না – সে খায় না সেপরে না, সে দেখে না সেই সম্পদ কি সম্পদ? সেই সমপ্দ দিয়ে সমরাস্ত্র হতে পারে। এখন আমরা দেখিনি এই গত পঁচিশ বছরে এই ভারতবর্ষে এ দুি ভাবুকের চিন্তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে খুব বেশি আলোচনা এবং যাঁরা পন্ডিত নন – যাঁরা রাজনীতিকে ব্যবহারিক প্রয়োগ করছেন তাঁদের মধ্যে তার প্রয়োগ ক'রবার একটা চেষ্টা। এবং আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে এঁদের মত ঠিক হোক বা বেঠিক হোক এদের মধ্যে যতখানি মিল তার চেয়ে বেশি অমিল থাকলেও এই দেশ যদি জীবন্ত দেশ হয় এদেশে যদি মনের একটা প্রাণশক্তি এখনও সম্পূর্ণ লোপ না পেয়ে থাকে তাহলে এই দুজন ভাবুকের চিন্তা এবং তাঁরা যে সব বিকল্প আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তার ব্যাপক আলোচনা, বিচার, আংশিকভাবে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ –তার গভীরভাবে প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই কথাটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করার জন্য আমি বিশেষভাবে এই আমন্ত্র গ্রহণ করেছিলাম।